গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | ৫ - ১১ জুলাই ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবি তুলুন সাংসদরা

চিঠি সেভ এডুকেশন কমিটির

(অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রকাশ এন শাহ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বিরোধী দলের সাংসদদের উদ্দেশে নিম্নলিখিত চিঠিটি দেন)

২০২০ সালের ২৯ জুলাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর ঘোষণা মাত্রই অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সংসদে কোনও বিতর্ক-আলোচনা ছাড়াই গায়ের জোরে মন্ত্রিসভার অনুমোদনে এই শিক্ষানীতি পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়াকে কোনও গুরুত্ব না দেওয়ায় সেটি সংশোধনও করা হয়নি। সেভ এডুকেশন কমিটি যে কারণে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে সেগুলি হল ঃ

১) ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে কাঠামো আছে, তার ভিত্তিকেই ধ্বংস করছে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২) এই শিক্ষানীতি শিক্ষার বেসরকারিকরণ, কর্পোরেটকরণ, ডিজিটাইজেশন, কেন্দ্রীকরণ এবং গেরুয়াকরণ করার ষড়যন্ত্রমূলক ব্লু-প্রিন্ট, ৩) সংবিধানে শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্য যুগ্ম তালিকাভুক্ত। এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে রাজ্যের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের স্বাধিকারে আঘাত করা হয়েছে, ৪) শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যয়ভারের দায়িত্ব থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে হাত তুলে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে এই শিক্ষানীতি। এর পরিণতিতে শিক্ষা বাজেটেও বরাদ্দ ক্রমশ কমবে, ৫) এই শিক্ষানীতি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধী, ফলে সার্বজনীন নয়, ৬) এই শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক

তিনের পাতায় দেখুন

আইন মেনে হকার সমস্যার সমাধান করুক সরকার

২৪ জুন নবান্নতে এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ হকার এবং ঝু পড়ি ও কলোনিবাসীদের বেআইনি আখ্যা দিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছেন। একই সাথে তিনি যে ভাবে কাউন্সিলর, পুলিশ এমনকি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও জবরদখলে মদত দেওয়া, টাকা নিয়ে ফুটপাথ, জমি দখল করতে দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন তা চমক সৃষ্টি করেছে মানুষের মনে।

প্রশ্ন হল, মুখ্যমন্ত্রী কি এ সব কিছুই জানতেন না, নাকি শহরাঞ্চলের উচ্চমধ্যবিত্ত এবং কর্পোরেট মালিকদের আস্থা অর্জনে এ তাঁর নতুন চমক? একই সাথে তিনি যে ভাবে হকার ও সরকারি জমিতে বসবাসকারী মানুষকে স্থানীয় ও বহিরাগত হিসাবে ভাগ করতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর ভোট রাজনীতির লক্ষ্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেই কোনও রকম বিভাগীয় নির্দেশনামা ছাড়াই পুলিশ প্রশাসন সেই মুহূর্ত থেকেই অতি সক্রিয় হয়ে উঠে কলকাতা সহ রাজ্যের নানা জায়গায় হকার উচ্ছেদ শুরু করে দিল। বুলডোজার দিয়ে দোকান ভেঙে দেওয়া, পণ্যসামগ্রী লুট করে নিয়ে যাওয়া, এমনকি ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদেও পুলিশ নেমে পড়ল।

যখন সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছে, তখন হাজার হাজার মানুষকে তাঁদের জীবিকা ও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হলে এক মারাত্মক সামাজিক সংকট যে নেমে আসতে পারে তা

দুয়ের পাতায় দেখুন

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

■ হকার উচ্ছেদ নিয়ে তুঘলকি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৮ জুন এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে ধর্মতলায় বিক্ষোভ। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। বিক্ষোভ থেকে সারা বাংলা হকার ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তি ঘোষ সহ তিন প্রতিনিধি শ্রমমন্ত্রীর কাছে এবং হকার ইউনিয়নের রাজ্য নেতা তপন মুখার্জীর নেতৃত্বে তিন প্রতিনিধি রাজ্যপালের দপ্তরে দাবিপত্র জমা দেন

আর্থিক সংস্কার কংগ্রেস করুক বা বিজেপি, তা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থেই

ভারতীয় অর্থনীতিতে এখন 'সুপবন' বইছে বলে মনে করেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। তাঁর কথায়, 'দেশের অর্থনীতিতে এর চেয়ে ভাল সময় কখনও আসেনি।' তাঁর মতে, 'অর্থনীতির চলতি গতি বজায় থাকলে আগামী এক দশকে প্রতি ১২ থেকে ১৮ মাসে এক লক্ষ কোটি ডলার যুক্ত হবে ভারতীয় অর্থনীতিতে। আর ২০৫০ সালে ভারতীয় অর্থনীতি ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে।'

সম্প্রতি মুম্বইতে ক্রিসিল রেটিংসের 'অ্যানুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সামিট' উপলক্ষে এক বক্তৃতায় কথাগুলি বলেছেন আদানি। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিরোমণি গৌতম আদানি তাঁর বক্তব্যে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস আমলে ১৯৯১ সালে নেওয়া অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমকে। বলেছেন, 'যদি ১৯৯১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়টায় ভিত তৈরি ও রানওয়ে নির্মাণ হয়ে থাকে তা হলে ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সেই রানওয়েতে বিমান টেক-অফ করেছে।' আদানির মতে, ১৯৯১ সাল ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটা বিরাট টার্নিং পয়েন্ট।

অর্থনীতিতে ভাল সময় মানে কী? সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতির ভাল সময় মানে তো মানুষের হাতে কাজ, সংসার প্রতিপালনের উপযোগী বেতন, মাথার উপর একটা ছাদ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা প্রভৃতি। আদানি বর্ণিত ভাল সময়ে কি এ-সব কিছু দেশের সাধারণ মানুষের কপালে জুটেছে? নাকি অর্থনীতি শুধু দেশের শিল্পপতি, পুঁজিপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট? এঁদের অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যাটা বাদ দিলে দেশের বাকি ৯৯ ভাগ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক

সাতের পাতায় দেখুন

দেশে পুলিশি রাজ কায়েম করতে চায় বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

জনসাধারণ এবং আইনবিদ সহ অন্যান্য প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১ জুলাই থেকে তিনটি কালা ফৌজদারি আইন চালু করে দিল। সরকারের দাবি, ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি পুরনো আইন পরিবর্তনের জন্যই এই নতুন আইন আনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই নতুন আইন আগের তুলনায় অনেক বেশি নির্মম ও দানবীয়। এই আইন দেশে পুলিশি রাজ কায়েম করবে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিজেপি সরকার গত দশ বছর ধরে যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা ও ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসন জারি রেখেছে, তারা সেটাই চালিয়ে যেতে চায়। এর মধ্য দিয়ে মেহনতি মানুষের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলতে চায় তারা।

আমরা এই আইনগুলি অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, আইনবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

হকার সমস্যার সমাধান

একের পাতার পর

বুঝতে অসুবিধা হয়নি মধ্যবিত্ত থেকে গরিব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের। তাঁরা সরকারের এই আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতিবাদ করছেন। পথচারীর পথচলার পরিসর, যানবাহনের চলার পরিসর বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনই এই হাজার হাজার পরিবারের মুখের গ্রাস রক্ষার প্রশ্ন কোনও সভ্য দেশের সরকার কোনও যুক্তিতেই এড়িয়ে যেতে পারে না।

সঙ্গত কারণেই কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হকাররা সংগঠিত ভাবে উচ্ছেদের প্রতিরোধে নেমেছেন। ২৫ জুন সিউড়িতে পুলিশ বুলডোজার নিয়ে হকার উচ্ছেদ করতে গেলে অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জেলা পরিষদের অফিস ঘেরাও করেন। বাধ্য হয়ে প্রশাসন উচ্ছেদ স্থগিত রাখে। ২৬ জুন মহাকরণে হকার সংগঠনগুলির সাথে সরকারের মিটিং চলার সময়েই আবার বীরভূমের প্রশাসন উচ্ছেদের উদ্যোগ নিলে অল বেঙ্গল হকার ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড মধুসূদন বেরা ও বীরভূম জেলা হকার ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মানস সিংহের নেতৃত্বে হকাররা ডিএম অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ডিএম-এসডিও-কে স্মারকলিপি দেন।

প্রতিরোধ গড়ে ওঠে মালদা জেলার চাঁচলে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে। অন্য জেলাতেও হকাররা প্রতিবাদে নামেন। সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও হকারদের প্রতিরোধের সামনে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী ২৬ জুন বলেন, তিনি হকার উচ্ছেদের জন্য বুলডোজার ব্যবহারের পক্ষে নন। হকারদের একটি কার্ড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এক মাস পরে তিনি সমস্ত বিষয়টি দেখবেন বলে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি ঘোষণা করেন। এক মাসের মধ্যে কমিটি সার্ভে করবে এবং বেআইনি জবরদখলকারীদের চিহ্নিত করে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। প্রশ্ন উঠছে, তিন দিন পর মুখ্যমন্ত্রীর এই কথার আগেই যে সব হকার ও ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদ করা হল, জিনিসপত্র লুঠ হয়ে গেল তাদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

মুখ্যমন্ত্রী হকারদের 'বেআইনি' বললেও আসলে তাঁর সরকারের প্রশাসন ও পুলিশই বেআইনি কাজ করে চলেছে। ২০১৪ সালে তৈরি হকার আইন 'প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশনে' সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা আছে— এক বছরের মধ্যে প্রতিটি রাজ্য সরকার রাজ্যের হকার বিধি প্রণয়ন করবে, ফুটপাতের এক-তৃতীয়াংশ স্থান নিয়ে হকাররা কেনাবেচা করতে পারবেন, হকারদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ৪০ শতাংশ হকার প্রতিনিধি নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করা হবে। এই টাউন ভেন্ডিং কমিটি সার্ভে করে হকারদের পরিচয়পত্র দেবে। বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। অথচ ১০ বছরেও সার্ভে হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এখন এক মাসে এই কাজ শেষ করবেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

২০১৬-তে মহাকরণের রোটান্ডায় নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তাঁর আধিকারিকের উপস্থিতিতে এক সভায় হকার সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের কাছে নগর উন্নয়ন দপ্তরের সেক্রেটারি একটি খসড়া বিধি পড়ে শোনান। কিন্তু সেই বিধির কপি উপস্থিত প্রতিনিধিদের হাতে না দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মতামত দিতে বলেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিনিধিরা এই খসড়া প্রত্যাখ্যান করেন এবং খসড়ার প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য দাবি করেন। আজ পর্যন্ত সেই বিধির কোনও কপি কোনও সংগঠনকে সরকারিভাবে দেওয়া হয়নি। নগর উন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজের পছন্দমতো কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠিত হল বলে ঘোষণা করলেও আজ পর্যন্ত কোনও গেজেট নোটিফিকেশন হয়নি। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন ও কলকাতা ভ্রাম্যমাণ হকার্স ইউনিয়ন এবং এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সহ সব কটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন এবং তাতে সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিদের যুক্ত করার দাবি জানানো হলেও কলকাতা কর্পোরেশন আজ পর্যন্ত তার কোনও উত্তর দেয়নি। রাজ্যের কোনও জেলাতেই টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন ও হকারদের পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজটি হয়নি। এই পরিচয়পত্র না থাকার কারণে করোনা অতিমারিকালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত দশ হাজার টাকা স্বল্প সুদে ও সহজ কিস্তিতে ঋণ থেকে রাজ্যের সমস্ত হকার বঞ্চিত থেকে গেছেন। এই সময়েও বাঁকুড়ার মাচানতলা, বর্ধমান স্টেশন, বারুইপুর, রায়দিঘি, সল্ট লেক ও কলকাতায় হকার উচ্ছেদ করে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এখন কাউন্সিলরদের টাকা নিয়ে হকার বসানোর জন্য অভিযুক্ত করছেন, অথচ টাউন ভেন্ডিং কমিটি থাকলে হকাররা নিজ অধিকারেই সুষ্ঠুভাবে ব্যবসার সুযোগ পেতে পারতেন। পরিকল্পিতভাবে হকারদের জায়গা দিলে ফুটপাথ কিংবা রাস্তা আটকানোর প্রশ্নই উঠত না। হকারদের শাসকদলের কাছে নতজানু রাখা এবং তাদের কাছে থেকে নেতাদের তোলা আদায়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই কি সরকার টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ ও শহরের দারিদ্র দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রকের হিসাবে হকাররা জাতীয় অর্থনীতির ৬৩ শতাংশ জোগান দেন। তাঁরা সাধারণত কোনও ব্র্যান্ডেড পণ্য বিক্রি করেন না। গ্রামীণ গৃহস্থ শ্রমিকরা ছোট ছোট কুটির শিল্পে এবং ক্ষুদ্র শিল্পে যা উৎপাদন করেন মূলত সেই সমস্ত পণ্যই হকাররা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেন। তাঁরা রাজপথে জনসাধারণের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ভরসা। পথ দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতেও তাঁরা এগিয়ে আসেন। এমনকি কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি বা বড় কোনও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশ হকার নেতাদের সাহায্য চেয়ে থাকে। আজ দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার, যার মধ্যে রয়েছে বহু উচ্চশিক্ষিত যুবক। বিভিন্ন বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক, কর্মচ্যুত লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দূর-দূরান্তে চলে যেতেন, আজ সারা দেশে কাজের অভাবে তাঁদের একটা বড় অংশ হকারি পেশায় প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছেন। সারা দেশ জুড়ে হকারি পেশার আবশ্যকতা এবং অর্থনীতিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সমাজে তাদের বিশেষ অবস্থান— বিষয়গুলি মাথায় রেখেই হকার আইন ২০১৪ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে টালবাহানা করে চলেছে। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটাতে হকার বাজারকে ধ্বংস করবার চেষ্টাই এর একমাত্র কারণ।

এই চেষ্টা বর্তমান সরকারই শুধু করেনি, অতীতে ১৯৯৬ সালে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার অপারেশন সানসাইন-এর মধ্য দিয়ে হকার উচ্ছেদ করে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের আস্থা অর্জন করতে চেয়েছিল। কলকাতার লক্ষাধিক হকারের সমস্ত সম্পদ সেদিন পুলিশ লুট করেছিল যার প্রমাণ সেই সময়কার সংবাদপত্রে পাওয়া যাবে। সেদিন মমতা ব্যানার্জী তার বিরোধিতা করতে রাস্তায় নেমেছিলেন। আজ ক্ষমতায় থাকতে হলে তাঁর প্রয়োজন একচেটিয়া পুঁজির আশীর্বাদ। তাই রিলায়েন্স, গোয়েঙ্কাদের মতো একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের শপিং মলের ব্যবসার স্বার্থে তিনি হকারদের নিয়ন্ত্রণের নামে উচ্ছেদ করবার মতো এইরকম একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

এ রাজ্যের বিজেপি নেতারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে এখন 'বুলডোজারের সামনে দাঁড়াব' বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার রেল এবং কেন্দ্রীয় সরকার অধিকৃত এলাকাকে হকার আইনের বাইরে রেখেছেন। অথচ রেলের উপর নির্ভর করে চলে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসা। গরিব সাধারণ মানুষের জন্য রেলপথে সামান্য টাকায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন হকাররা। হকার ও ছোট দোকানদারদের উচ্ছেদ করে কেন্দ্রীয় সরকার রেলের জমি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। রেলের প্ল্যাটফর্মগুলিতে সৌন্দর্যায়নের নামে হকার উচ্ছেদ করে খাবার সহ বহু পরিষেবাকেই বড় বড় পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা হকারি করে সংসার চালান তাঁরা রেলে কিংবা শহরের রাস্তায় সর্বত্রই কেন্দ্রে বা রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও পুলিশ-প্রশাসনের তোলাবাজির অসহায় শিকার। এর বিরুদ্ধে আজ শুধু হকাররাই নয়, সমাজের সমস্ত স্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ সব স্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে আছে হকারদের জীবিকা রক্ষা ও পথচারীদের চলার পরিসর বজায় রাখার জন্য সরকারকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে বাধ্য করার বিষয়টি।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে বীরভূমের সিউড়িতে ২৮ জুন সকালে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিলের পর পৌরসভা এবং প্রশাসন ভবনের সামনে পথ অবরোধ করা হয়। পৌরসভার সিদ্ধান্ত ছিল ওই দিনই সকাল দশটা থেকে উচ্ছেদ অভিযানে নামবে। কিন্তু আন্দোলনের তেজ দেখে প্রশাসন পিছু হটে ও উচ্ছেদ অভিযান একমাস স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়।

জীবনাবসান

দলের বর্ষীয়ান আবেদনকারী সদস্য কমরেড বিধান হালদার ২২ মে উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া ব্লকের বাগজোলা গ্রামে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মৃত্যুর খবর পেয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দাউদ গাজি ও কমরেড ছোট্টু মির্জা তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

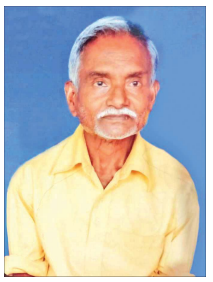

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি কমরেড বিধান হালদার দলের সংস্পর্শে আসেন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে তিনি সংসার নির্বাহ করতেন। কিন্তু দলের কর্মীদের কাছে তাঁর বাড়ি ছিল একটা নিশ্চিত আশ্রয়। কমরেড বিধান হালদার ও তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দের সাথে সামান্য সঙ্গতি সত্ত্বেও কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তিনি অত্যন্ত দরদি মনের একজন মানুষ ছিলেন। এলাকার সকলের কাছে, বিশেষ করে গরিব মানুষের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। মজুরি খাটা থেকে শুরু করে যখন যে কাজই করেছেন তার মধ্যেই সব সময় তিনি দলের বক্তব্য প্রচার করতেন। অন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ছাড়া এ দেশের গরিব মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি তাঁর পরিবারকেও দলের সাথে যুক্ত করেন। ওই সময় ওই এলাকায় দলের আর কোনও কর্মী ছিল না। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ বুকে নিয়ে দলের ঝান্ডা বহন করা খুব সহজ কথা ছিল না। কংগ্রেস ও সিপিএম দলের পক্ষ থেকে নানা ভাবে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হত। কিন্তু কমরেড বিধান হালদার কোনও ভয় ও প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি বাস করতেন সামান্য এক টুকরো খাস জমির উপর। পরবর্তীকালে তৃণমূলের আমলে তাঁকে উচ্ছেদ করবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। এসইউসিআই(সি) দল সংগঠনগতভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সেই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে।

২৫ জুন বাদুড়িয়া দলীয় কার্যালয়ে প্রয়াত কমরেড বিধান হালদারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। এ ছাড়াও দলের জেলা কমিটির সদস্য ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল অত্যন্ত দরদি মনের অভিভাবকসুলভ একজন সাথীকে।

কমরেড বিধান হালদার লাল সেলাম

বিরসা মুন্ডার ১২৫তম শহিদ দিবসে

আদিবাসী ও বনবাসীদের উচ্ছেদ রোখার শপথ

এ বছর ছোটনাগপুরের সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলান'-এর অবিসংবাদী নেতা শহিদ বিরসা মুন্ডার ৯ জুন থেকে ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী শুরু হয়েছে। এ বছর ১৫ নভেম্বর শুরু হচ্ছে ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। এই সময়েই দেশ চলেছে প্রধানমন্ত্রী কল্পিত 'অমৃতকাল'-এর মধ্য দিয়ে। আজও এ দেশে আদিবাসী ও গরিব মানুষের এক বিশাল অংশকে জীবন ধারণের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল এমন কয়েক লক্ষ আদিবাসী ও বনবাসী পরিবার জঙ্গলের অধিকার আইনের উপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে ভিটেমাটি ও চাষের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। উন্নয়নমূলক কাজের নামে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং জঙ্গল ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই এক কোটির বেশি আদিবাসী ও গরিব মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। তারা যথাযথ পরিমাণে ক্ষতিপূরণও পায়নি যার সাহায্যে নিজেদের ভালভাবে পুনর্বাসিত করতে পারে। তাদের অধিকাংশই এখন দিনমজুর বা পরিযায়ী শ্রমিক। অনেকেই শহরের ফুটপাথের বাসিন্দা।

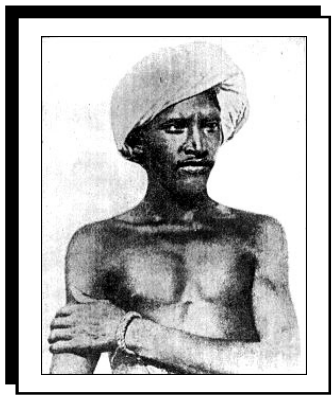

বর্তমানেও জঙ্গল ও তৎসংলগ্ন এলাকার গরিব সাধারণ জনগণ জীবন-জীবিকার জন্য জঙ্গলের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। সাংস্কৃতিক ও পরম্পরাগত সম্পৃক্ততা এবং নিজস্ব স্বার্থবোধ থেকেই তারা জঙ্গলকে রক্ষা করে আসছে। জঙ্গল ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৯০ শতাংশ গরিব মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল।

ব্রিটিশ আমলে বনজ দ্রব্য থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ী ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে জঙ্গল ধ্বংস শুরু হয়ে এখনও পর্যন্ত চলেছে। ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতে ২৩ লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল হারিয়ে গেছে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ মে ২০২৪)। গত ২৬ জুলাই ২০২৩ বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী বিল-২০২৩ সংসদের বাদল অধিবেশনে লোকসভায় পাশ করিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আইনে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই (১২ আগস্ট, ২০২৩) ওড়িশার রায়গদা জেলার সিজিমালি পাহাড়ে বেদান্ত গোষ্ঠী বনভূমির দখল নিতে যায়। অপর এক প্রকল্পের জন্য আদানি গোষ্ঠী ওড়িশার রায়গড়া ও কালাহান্ডি জেলার কুক্রমালি পাহাড়ে বনভূমির দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং বনভূমি ধ্বংস রুখে দেয়। ছত্তিশগড়ের হসদেও জঙ্গল ধ্বংসের কথা এবং স্থানীয় আদিবাসী ও গরিব গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের কথা বহুল প্রচারিত ঘটনা। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতে মোট বৃক্ষ অঞ্চলের ক্ষতির ৯৫ শতাংশ প্রাকৃতিক বনভূমির মধ্যে ঘটেছে (গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ রিপোর্ট, খান গ্লোবাল স্টাডিজ, ২২এপ্রিল ২০২৪)।

বনাঞ্চলের সংকুচিত হওয়া একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা। পৃথিবী জুড়ে "১৯৯০-২০১০ এর মধ্যে বছরে গড়ে ১৫.৫ মিলিয়ন হেক্টর, ২০১০-২০১৫ এর মধ্যে গড়ে ১২ মিলিয়ন হেক্টর বন, ২০১৫-২০২০ এর মধ্যে প্রতি বছর গড়ে ১০ মিলিয়ন হেক্টর বন ধ্বংস হয়েছে।" (ফরেস্টেশন ফ্যাক্টস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স' ২০২৪ (গ্লোবাল ডেটা) ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, টোনার বাজ)। "বন ধ্বংসের চারটি প্রধান কারণ হল— ১) কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ি তৈরির জন্য। ২) কৃষিজমির জন্য জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। (এর মধ্যে রয়েছে কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প, যেমন পেপার মিল এবং চিনি শোধনাগার)। ৩) গবাদি পশুর জন্য চারণভূমি তৈরি করতে বন পরিষ্কার করা হয়েছে। ৪) দাবানলে পুড়ে যাওয়া বন।" (ওই)।

বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্দোলন বিস্তৃতি পাচ্ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রধানত দরিদ্র বনবাসী এবং আদিবাসীরাই প্রতিবাদ করছেন, আন্দোলন গড়ে তুলছেন। পরিবেশকর্মী ও পরিবেশ সচেতন নাগরিক যারা কর্পোরেটদের মুনাফার লালসা থেকে জঙ্গলকে রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলছেন তাঁরা এই আন্দোলনকেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্দোলনের পরিপূরক আন্দোলন হিসাবে সবদিক থেকে সাহায্য করছেন। বিরসা মুন্ডার জীবন-সংগ্রাম আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসীদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সৈনিকদের প্রেরণার উৎস। সাথে সাথে পরিবেশকর্মী ও পরিবেশ সচেতন নাগরিকদের কাছেও বিরসা মুন্ডার জীবন-সংগ্রাম অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। বিরসা মুন্ডার ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর জীবন-সংগ্রামকে জল-জমি-জঙ্গল রক্ষার মধ্য দিয়ে পরিবেশ রক্ষা তথা মানবসভ্যতা রক্ষার সংগ্রামে পরিণত করার ডাক দিয়েছে জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি সহ জঙ্গলবাসী ও জঙ্গল রক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা।

উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষি কনভেনশন

গঠিত হল উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র চা-চাষি সংগ্রাম কমিটি। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এআইকেকেএমএস এর উদ্যোগে ২৩ জুন জলপাইগুড়ির 'নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন' হলে এক কনভেনশনে এই কমিটি গঠিত হয়। শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ধান-পাট-আলু এইসব প্রথাগত চাষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাষি আর লাভ করতে পারছেনা, ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা বিকল্প চাষ হিসেবে তাদের দু

কনভেনশনে উপস্থিত ক্ষুদ্র চা-চাষিরা

বিঘা ৫ বিঘা জমিতে চা গাছের চাষ বেছে নেয়। তাদের কাঁচা চা-পাতা ক্রয় করবার খরিদ্দার একমাত্র ফ্যাক্টরি মালিক। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা চাষিরা প্রথম দিকে একটু দাম পেলেও এখন তারা লোকসানের মুখে। তারা যা খুশি দাম দিয়ে কাঁচা চা পাতা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে কেনে। কখনও কখনও তাঁরা উৎপাদন খরচের কম দামেও কাঁচা চা পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফ্যাক্টরি মালিকের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কাঁচা চা পাতা কেনায় ফড়েরাজের দৌরাত্ম্য চলে। ফলে চাষি আরও বেশি বিপাকে পড়ে।

চা-শিল্প আজ বেঁচে আছে এই ক্ষুদ্রপ্রান্তিক চাষিদের কাঁচা চা-পাতা সরবরাহ করার উপর। সরকার প্রতি বছর এই চা শিল্প থেকে শত শত কোটি টাকা ট্যাক্স বাবদ আয় করে। অথচ এই চা-চাষিদের বাঁচানোর জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা ও প্রকল্প নেই। কনভেনশনে দাবি ওঠে—

১) উৎপাদন খরচের কমপক্ষে দেড়গুণ দামে সরকারকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা চা পাতা কিনে ফ্যাক্টরি মালিকের কাছে বিক্রি করতে হবে।

২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষিদের অতি স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক ও জৈব সার এবং কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে।

৩) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চা চাষের ক্ষতি হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪) আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চা চাষের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কনভেনশনে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেডস রুহুল আমিন, আবুল কাসেম ও তরণী রায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, সংঘবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বাঁচার পথ নেই। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উত্তরবঙ্গের কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষিকে সংগঠিত করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কনভেনশন থেকে হরিভক্ত সরদারকে সভাপতি ও জগদীশ অধিকারীকে সম্পাদক করে ১৭ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। ২৮ জুন 'টি বোর্ডে'র অধিকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ চিঠি সেভ এডুকেশন কমিটির

একের পাতার পর

এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মূলনীতির বিরোধী।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ও তাদের জোটসঙ্গী বাদ দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সেভ এডুকেশন কমিটির দাবিগুলি সমর্থন করা এবং সেগুলি তাদের ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছিল কমিটির পক্ষ থেকে। প্রতিটি দলকে এই জনবিরোধী শিক্ষানীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের দল জিতলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নির্বাচনে বিজেপির শক্তি ক্ষয় হয়েছে। গঠিত হয়েছে জোট সরকার। বিরোধী দলগুলি এই সুযোগ ব্যবহার করে সংসদের উভয় কক্ষেই তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করে এই শিক্ষানীতি প্রত্যাহারে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুক, কমিটি চিঠিতে সেই আশা ব্যক্ত করেছে। কমিটি জানিয়েছে, এমনকি বিরোধীরা সংসদে এ বিষয়ে একটা নতুন প্রস্তাব পেশ করুন।

জাতীয় শিক্ষানীতির কেন্দ্রীকরণের কর্মসূচিকে আরও সংহত করার লক্ষ্যে তৈরি এনটিএ কর্তৃক নিট, ইউজিসি নেট পরীক্ষার সাম্প্রতিক ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সিএসআইআর-নেট এবং নিট-পিজি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হল, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণে সেভ এডুকেশন কমিটির বিরোধিতা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল। কমিটি মনে করে, যদি জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়, তা হলে সারা দেশে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

এআইডিওয়াইও-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

২৬ জুন এআইডিওয়াইও-র ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল সারা দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা কার্যালয়ে এবং রাজ্যে ২৩৬টি স্থানে শহিদ বেদিতে মাল্যদান, সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেন যুব আন্দোলনের কর্মীরা।

কলকাতার সভা

কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সেখানে সভা পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী। কমরেড নিরঞ্জন নস্কর যুব সমাজের কাছে বেকার সমস্যা সমাধান সহ টেট-নিট-নেট দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল। সংগঠনের সঙ্গীত ও গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ওই দিন বিকেলে কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মোশন পিকচার্স হলে অনুষ্ঠিত সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুবকরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

বাঁকুড়ায় ছাত্রবিক্ষোভ

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি, রাজ্য শিক্ষানীতি'২৩, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স ও স্কুলস্তরে অবৈজ্ঞানিক সেমিস্টার প্রথা বাতিল, সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্তভাবে শিক্ষক নিয়োগ, গণপরিবহণে ছাত্রছাত্রীদের এক-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা, নেট-নিট দুর্নীতিতে যুক্তদের শাস্তি এবং জেলার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের দাবিতে বাঁকুড়া জেলা কমিটির আহ্বানে জেলাশাসক দপ্তরে ২৭ জুন ছাত্রবিক্ষোভ হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী সামিল হন। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। ছাত্র সমাবেশে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। শহর পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছালে পুলিশ বাধা দেয়। চলে তুমুল বিক্ষোভ। পরে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। জেলা প্রশাসন দাবিগুলি পূরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মদের দোকান রুখে দিলেন সবংয়ের গ্রামবাসীরা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের মশাগ্রামে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের উদ্বোধন আটকে দিলেন গ্রামবাসীরা। বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামবাসীরা গ্রাম কমিটি গঠন করে মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা বিডিও, আবগারি দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। ২৪ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে দোকানটির উদ্বোধনের খবর পেয়ে গ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকশো মানুষ, যাদের বেশিরভাগ মহিলা জড়ো হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, দোকানে তালা লাগিয়ে দেন। পুলিশ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

তিন কালা আইনের বিরুদ্ধে ১ জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের প্রতিবাদ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন তিনটি কালা আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য সংহিতা ১ জুলাই থেকে চালু করেছে। চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ভাবে সংসদের উভয় কক্ষ থেকে ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে এবং বিলের ওপর কোনও প্রকার বিতর্ক করতে না দিয়ে তা সংসদে পাশ করানো হয়েছে।

বারুইপুর কোর্ট

কলকাতা হাইকোর্ট

প্রতিবাদে লিগাল সার্ভিস সেন্টার ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন কোর্টে প্রতিবাদ সভা ও আলোচনা সভা সংগঠিত করেছে। রাষ্ট্রপতি ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়ে এগুলি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। এই সব আইন অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে ২৫-২৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি ও হাইকোর্ট সহ রাজ্যের অন্যান্য কোর্টের আইনজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো হয়েছে।

সিপিডিআরএসের প্রতিবাদ

এই তিন কালা আইনের বিরোধিতা করেছে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ২৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, এগুলি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হরণকারী আইন। ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত করে আইনের আধুনিকীকরণের কথা বলা হলেও, নতুন আইন তিনটির ধারা ও উপধারা বাস্তবে ঔপনিবেশিক আইনের থেকেও মারাত্মক।

এই আইনে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, সরকারি আইনি পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ কমিয়ে পুলিশের হাতে মাত্রাছাড়া ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাস দমনের জন্য বিশেষ আইনকে (যে আইন প্রয়োগ করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন হত) কার্যত সাধারণ আইনে পরিণত করে, তা যে-কোনও প্রতিবাদী মানুষের ওপর প্রয়োগ করার অবাধ স্বাধীনতা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরনো আইনের সর্বাধিক ১৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ দিন পর্যন্ত অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে বন্দি রাখার সুযোগ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকারের ছিটেফোঁটা যেটুকু অন্তত কাগজে-কলমেও আছে, নতুন আইনগুলি চালু করার মাধ্যমে তা-ও নিঃশেষিত হয়ে যাবে। ভারত পরিণত হবে এক পুলিশি রাষ্ট্রে। ১ জুলাই 'সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

তামিলনাড়ুতে বিষমদে মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ

তামিলনাড়ুতে বিষমদ খেয়ে ৫৭ জনের মৃত্যু ও ১৫৬ জনের অসুস্থতার জন্য ডিএমকে সরকারের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড এ রেঙ্গাস্বামী এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় ২০ জুন দুই মহিলা সহ এতগুলি মানুষের মৃত্যু হয়েছে সরকারের অপদার্থতার কারণে। গত বছরে মারাক্কানাম শহরের একটি ঘটনায় ২২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তখন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে, তাদের গ্রেপ্তার করবে এবং পুলিশের বিশেষ বাহিনী এ ব্যাপারে নজরদারি চালাবে ও সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেবে সরকারকে। এটা স্পষ্ট, সে-সব ছিল নিছক কথার কথা।

আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি— পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তা, রাজনীতিক, নেতা-মন্ত্রীদের অপরাধীদের তালিকায় রাখতে হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি সরকারকে বলেন, মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ, পরিবারের অন্তত এক জনকে বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজ দিতে হবে। চিকিৎসারতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবি জানান তিনি। রাজ্যে মদ এবং মাদকদ্রব্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র-যুব ও মহিলাদের আবেদন জানান তিনি।

যুদ্ধবাজ ইজরায়েলের সাথে ফুটবল ম্যাচ বাতিল করল বেলজিয়াম

দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সঙ্গীত-চলচ্চিত্র জগত, রাস্তাঘাটে সর্বত্র। এ বার তার প্রভাব পড়ল ফুটবল জগতেও। রাজধানী ব্রাসেলসে আগামী সেপ্টেম্বরে হতে চলা ইজরায়েলের সাথে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ বাতিল করতে বাধ্য হল বেলজিয়াম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের একতরফা আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বারবার। বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে— সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ‘প্যালেস্টাইনকে অবিলম্বে মুক্ত করো, ইজরায়েল প্যালেস্টাইন থেকে হাত ওঠাও’ ইত্যাদি পোস্টার প্রদর্শন করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ছাত্র-গবেষকরা। পুলিশের সাথে রাস্তায় ব্যারিকেড ফাইট করেছেন অসংখ্য মানুষ।

প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলি হানাদারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ব্রাসেলসে

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ ফুটবল মাঠেও ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় বেলজিয়াম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এই ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল। কর্তৃপক্ষ আঁচ করছেন, ব্রাসেলসে ৬ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলের সাথে এই ম্যাচ হলে রাস্তা, গ্যালারি কিংবা মাঠে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তাতে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। আর প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের হানাদারির প্রতিবাদে স্থানীয় দর্শকরা যদি এই খেলা বয়কট করে, তা হলে আর্থিক ক্ষতি হবে বিরাট।

প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের মতো বেলজিয়ামের সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। ইউরোপের এই দেশটিতে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। তাতে যোগ দিয়েছেন শত শত মানুষ।

খেলোয়াড়রাও যে নিজস্ব জগৎ ছাড়া অন্য বিষয়ে সচেতন ভাবে ভাবনা-চিন্তা করেন, তার সাম্প্রতিক উদাহরণ ফ্রান্সের ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে। তিনি নিজের দেশের দক্ষিণপন্থী শক্তিকে রুখে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। বলেছেন, ‘সবার আগে আমি দেশের নাগরিক। অনেকে বলেন, ফুটবলের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা কেউ দেশের পরিস্থিতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারি না।’

এর আগেও বিশ্বের লড়াকু মানুষের সমর্থনে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে দেখা গেছে আর্জেন্টিনার বিশ্বখ্যাত ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনাকে। তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁর খেলার বুট তুলে ধরে প্যালেস্টাইনের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের মতো আর্জেন্টিনার প্রতিটি মানুষ খেলার প্রতিটি পাস এবং গোল উৎসর্গ করছি প্যালেস্টাইনের মানুষের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। আমি নিশ্চিত, বিশ্বের প্রতিটি শিশুই ফুটবলে শট মারে সেই লক্ষ্য নিয়েই।’

খেলোয়াড়, গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক-শিক্ষাবিদরা যে দেশেরই নাগরিক হোন, নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে রয়েছে মানুষ হিসেবে তাদের সচেতন ভূমিকা। নিজ দেশের বা অন্য দেশের মাটিতে ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন, তা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলে সব দেশের শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু তা ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়ে ইতিহাস রচনা করে সচেতন মানুষ।

(সূত্র ঃ বিবিসি, স্পোর্টসস্টার-১৯ জুন, ২০২৪)

কেনিয়ায় গণবিক্ষোভ
প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব

দু’বছর আগের শ্রীলঙ্কার গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি ফিরিয়ে সম্প্রতি উত্তাল জনবিক্ষোভে কেঁপে উঠল কেনিয়া। ২৫ জুন জনরোষের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল পার্লামেন্ট ভবনের একাংশ। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫৩ জন বিক্ষোভকারীর। আহত কয়েকশো। আন্দোলনের চাপে দাবি মানতে বাধ্য হলেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো।

বিক্ষোভের শুরু ‘আর্থিক বিল-২০২৪’-কে কেন্দ্র করে। সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থা আইএমএফ-এর শর্ত মেনে বিপুল ঋণ পাওয়ার বিনিময়ে এই বিল পাশ করিয়ে রুটি, চিনি, ভোজ্য তেল, ওষুধ সহ অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর কর চাপানোর ঘোষণা করেছিল রুটো সরকার। এর বিরুদ্ধেই ফুঁসে ওঠে জনরোষ। গরিবি-বেকারিতে বিপর্যস্ত জনসাধারণের পকেট কেটে সরকারের বড়কর্তাদের বিলাস-ব্যসন, বিপুল আর্থিক বৈষম্য ও ব্যাপক দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ মানুষ নির্মম পুলিশি আক্রমণ উপেক্ষা করে পথে নামে।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার অর্থনীতি গত কয়েক বছর ধরে ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত। বাজেটের একটা বড় অংশ চলে যায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নানা ঋণের সুদ মেটাতে। এই অবস্থায় ত্রাতা সেজে এগিয়ে এসেছে আইএমএফ। এ বছরের শুরুতে বেশ কয়েকটি শর্তের বিনিময়ে আইএমএফ ৯৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ঋণ দিতে রাজি হয় রুটো সরকারকে। এই শর্তের অন্যতম হল আর্থিক সংস্কার তথা জনগণের উপর কর চাপানো, যা ‘আর্থিক বিল-২০২৪’-এর মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে চেয়েছিল কেনিয়া সরকার।

ব্যারিকেড ভেঙে পার্লামেন্টে ঢুকছেন বিক্ষোভকারীরা

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলিকে লুটে নেওয়ার এ হল সাম্রাজ্যবাদীদের চেনা ছক। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মতো সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই পথেই তাদের খেলা সাজায়। আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত দেশগুলিকে সাহায্য করার নামে প্রথমে তারা ঋণের ঝুলি নিয়ে হাজির হয়, সঙ্গে থাকে কিছু শর্ত। ঋণের বিনিময়ে শর্তের জালে জড়িয়ে যায় ঋণগ্রহীতা দেশগুলি। শর্ত মেনে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার সমাজকল্যাণমূলক ক্ষেত্রগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নিতে থাকে। দেশের সরকারি সংস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার একে একে তুলে দিতে থাকে বেসরকারি মালিকের হাতে। এতে প্ররোচনা থাকে দেশের বৃহৎ পুঁজি গোষ্ঠীগুলিরও। ফলে চলতে থাকে দেশি-বিদেশি পুঁজির দেদার লুঠতরাজ। এরই সঙ্গে ঋণশোধের টাকা জোগাড় করতে আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের উপর ক্রমাগত আরও বেশি করে কর চাপাতে থাকে ঋণগ্রহীতা সরকার। সরকারি সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত সাধারণ মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকে।

কেনিয়াতেও একই ঘটনা ঘটেছে। ঋণের চাপে জর্জরিত রুটো সরকার আইএমএফ-এর বিপুল দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে তাদেরই নির্দেশমতো নতুন আর্থিক বিল এনে বিপুল করের বোঝা চাপাতে চেয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে, যা সরোষে প্রত্যাখ্যান করেছে কেনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, বিশেষত যুবসমাজ। এমনিতেই আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো কেনিয়াতেও আর্থিক বৈষম্য চরমে। গরিবি-বেকারিতে সাধারণ মানুষ জর্জরিত। ২০২২-এ চাপানো করের ধাক্কায় এমনিতেই জিনিসপত্রের চড়া দামে নাভিশ্বাস উঠছে জনসাধারণের। এর উপর নতুন আর্থিক বিল এনে আবার কর চাপানোর সরকারি পরিকল্পনায় তাদের ক্ষোভ সমস্ত সীমা ছাড়িয়েছে।

সমাজমাধ্যমে এই বিলের কথা প্রচারিত হতেই বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে কেনিয়ায়। ১৮ জুন নাইরোবি সহ অন্য শহরগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষের মিছিলে রুটো সরকার ও আইএমএফ-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার স্লোগান ওঠে। বিক্ষোভকারীদের বেশিরভাগের বয়সই ৩০-এর নিচে। যথারীতি হামলা চালায় পুলিশ। গ্রেফতার হয় ৩০০-রও বেশি বিক্ষোভকারী। কিন্তু জলকামান, কাঁদানে গ্যাস চালিয়েও বিক্ষোভ দমাতে ব্যর্থ হয় পুলিশ।

২০ জুন পার্লামেন্টে ওই বিলের উপর ভোটাভুটির দিনে নাইরোবি, কাকামেগা, নাকুরু, মোম্বাসা ইত্যাদি শহরে শহরে হাজার হাজার তরুণ বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভে পুলিশ গুলি চালালে নিহত হন ২৪ বছরের এক যুবক। এই ঘটনায় আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। ২৫ জুন পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক উঠলে বিল বাতিল ও প্রেসিডেন্ট রুটোর পদত্যাগের দাবিতে দেশ জুড়ে সোচ্চার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা কেনিয়া। ব্যারিকেড ভেঙে পার্লামেন্টে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভকারীরা, আগুন ধরিয়ে দেয় ভবনের একাংশে। পুলিশ বেপরোয়া হামলা চালায়। নাইরোবি ও তার আশপাশের শহরগুলিতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ৫৩ জন বিক্ষোভকারী, আহত হন শত শত।

গণবিক্ষোভের তীব্রতায় হতভম্ব, আতঙ্কিত

আটের পাতায় দেখুন

প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের হামলা বন্ধের দাবিতে
শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ

গত অক্টোবর মাস থেকে প্যালেস্টাইনের উপর একতরফাভাবে ইজরায়েলের ধারাবাহিক আক্রমণে শিশু সহ হাজার হাজার নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করার বিরুদ্ধে কলকাতায় বামপন্থী দলগুলির প্রতিবাদের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও ২৬ জুন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। শহর জুড়ে মিছিল এবং ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

পাঠকের মতামত

মূল্যবৃদ্ধি কেন

গণদাবীর ২১ জুন সংখ্যায় মূল্যবৃদ্ধির ওপর যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বিশ্লেষণমূলক। লেখাটির সংযোজনী হিসাবে দু-তিনটি বিষয় রাখছি। প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বলেছেন, কোর ইনফ্লেশন বা মূল মুদ্রাস্ফীতি কমলেও খাদ্যপণ্যের দাম কমেনি। শুনলে মনে হয় যেন কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা, কিন্তু কথাটার কোনও মানে নেই। খাদ্যপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যদি আকাশছোঁয়া হয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি কী করে কমে তা তাঁদের মতো 'পণ্ডিত'রাই বলতে পারবেন! কবির ভাষায় এ সব হচ্ছে, বাজে কথার ফুলের চাষ।

দ্বিতীয়ত, পাইকারি বাজারের মূল্যের সঙ্গে খুচরো বাজারের দামের এত বিস্তর ফারাক কেন, তা সরকারি পণ্ডিতরা কখনওই উল্লেখ করেন না। করলে এই চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুণে ধরা ব্যবস্থাটার স্বরূপ ফাঁস হয়ে যাবে। শুধু পরিবহণের খরচ বৃদ্ধির অজুহাত তুলে 'মধ্যবর্তী দুষ্টচক্রের' উপস্থিতি, পকেট ভারী করা, দাপিয়ে বেড়ানো ইত্যাদিকে আড়াল করা যাবে না।

তৃতীয়ত, সকলেই জানেন, এক শ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ী, ফড়ে, মজুতদার, কালোবাজারি, গ্রামীণ বাহুবলী, সরকারি প্রশাসন, পুলিশ, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা, ফাটকাবাজ নিয়ে গড়ে ওঠা এক অশুভ চক্র পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে। এরা নামমাত্র দামে চাষিদের থেকে ফসল কিনে নিজেদের ভাণ্ডার যথেচ্ছ ভাবে পূরণ করার পর কৃত্রিমভাবে খুচরো বাজারে দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। যেহেতু সকলেই লাভের ভাগ পায়, তাই টাস্ক ফোর্স হোক বা টহলদারি পুলিশ সকলেই চোখ বুজে থাকে।

চতুর্থত, মজুতদার মূলত কারা? সকলেই জানেন আনাজ, ফল ইত্যাদি কোল্ড স্টোরেজে ধরে রাখা হয়। এই বড় বড় কোল্ড স্টোরেজের মালিকরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মজুত রেখে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে। তারপর বেশি দামে গুদামজাত পণ্য কিস্তিতে ছাড়ে। সরকার কিছু বলে না। কারণ, এই মজুতদাররাই তো সরকারি দলকে টাকা জোগায়। আবার সাথে সাথে এরাই রটিয়ে দেয় যে, ওমুক মাসে রমজান আছে তাই ফলের বাজার চড়বে, জামাইষষ্ঠী আছে তাই আনাজপাতির দাম বাড়বে। আজ নীলষষ্ঠী, কাল গঙ্গাপুজো, পরশু রক্ষাকালীর পুজো— বারো মাসে তেরো পার্বণ, ফলে জিনিসের দাম বাড়া বন্ধ হওয়ার ফুরসত কোথায়? সাধারণ মানুষ ভাবে বুঝিবা তাই সত্য। এক ঢিলে দুই পাখি মারা— দামও বাড়ানো গেল আর ক্রেতাকুলকেও বোকা বানানো গেল। সরকারি মদতে প্রশাসনের নাকের ডগায় তো এটাই চলছে।

সব শেষে আপনাদের লেখায় একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়েছে। ডেরিভেটিভ ট্রেডিং বা খাদ্যপণ্যের ওপর ফাটকা খেলার প্রবর্তন বিশ্বায়নের উদারনীতির হাত ধরে অনেক আগেই হয়েছে ক্যাপিটাল মার্কেট সংস্কারের নামে। এটা বিজেপি আমলে শুরু হয়েছে, এই তথ্য ঠিক নয়। শুরু হয়েছে কংগ্রেস আমলে।

অধ্যাপক এস কে দাশগুপ্ত
কলকাতা-৩১

নির্বাচনে এই বিপুল খরচের উৎস কী

সর্বংসহা ভারতবাসী আরও একটা লোকসভা ভোট দেখল, সাথে অজস্র প্রতিশ্রুতির বুলি, যা আদৌ কোনও দিনও হয়ত পূরণ হবে না। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের পীঠস্থানে এইভাবেই ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু আম-জনতার হাল বিশেষ বদলায় না।

প্রশ্ন হল, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ খরচ প্রার্থীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে কিংবা দলের তরফ থেকে করা হয় সেটা আসে কোথা থেকে? যাঁরা সাংবিধানিক ও আভিধানিক অর্থেই 'পাবলিক সার্ভেন্ট' হতে চান তাঁদের নির্বাচনে জেতাবার জন্য এত খরচ করতে হয় কেন? যদি আমরা এই সারসত্যকে স্বীকার করে নিই যে নির্বাচনে খরচ হতে থাকা সমস্ত অর্থই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের, তা হলে তো সেই সাধারণ মানুষের এটুকু জানার অধিকার আছে যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বাহিত হয়ে এই যে বিপুল অর্থের জোগান— এর উৎস কোথায়, কী ভাবে তা প্রবাহিত হচ্ছে এবং সবশেষে তা কোথায় গিয়ে পতিত হচ্ছে? এই যে এত প্রচার, তার জন্য এত জনসভা, দেশ কিংবা রাজ্যের এ মাথা ও মাথা কয়েক ঘণ্টায় চষে ফেলার জন্য কপ্টার কিংবা চপার কিংবা চার্টার্ড ফ্লাইটের এত আয়োজন সদা তৈরি থাকছে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, মিটিং-মিছিলের সাফল্য দেখানোর জন্য জনতা-জনার্দনকে বাড়ি থেকে বয়ে এনে হাজির করিয়ে তাঁদের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কখনও কখনও ভোজন দক্ষিণা দিয়ে বিদেয় করা হচ্ছে— এ সবের জন্য বিপুল খরচ হচ্ছে। এছাড়া ফ্লেক্স, ব্যানার, ফেস্টুন, ছোট-বড়-মাঝারি মাপের নেতার জন্য কনভয়ে গাড়ির লাইন বাড়াতেও তো রাজনৈতিক দলগুলোর বিরাট খরচ হয়!

কিন্তু মূল কথাটি হল, যে পথে যে ভাবেই অর্থের জোগান আসুক না কেন তা কিন্তু সরাসরি জনগণেরই টাকা। জনগণের অর্থরাশি এভাবে খোলামকুচির মতো কি সত্যিই ব্যবহার করা যায়? এ প্রশ্ন সার্বিকভাবে উঠে আসছে না কেন? বাস্তবে প্রশাসন বা রাজনৈতিক স্তরেও এই অর্থ সরবরাহ প্রতিরোধের কোনও কার্যকর প্রয়াস নেওয়া হয় না। দেশে আইন আছে, প্রশাসন আছে, নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলি আছে, কিন্তু সবই 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'। জনগণের টাকায় এখনকার রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের তালিকায় আমরা প্রত্যক্ষভাবে গণচেতনামূলক, আপাতভাবে জীবন-ছোঁয়া বিষয়গুলিকে স্থান পেতে দেখি না।

এই ব্যবস্থায় ভোটারকে শুধুই বোবা-কালা হয়ে থাকতে হয় নির্বাচনের রঙ্গমঞ্চে। তাই প্রয়োজন তথ্যগত অজ্ঞতা ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতার ব্যাধি কাটানো। প্রত্যেকের কাছে একটাই বিনম্র আবেদন, জনমানসে প্রশ্ন রাখুন— আমজনতার ঘাম-রক্তের এই যে বিপুল টাকা নির্বাচনী প্রচারে একপ্রকার হোস-পাইপে করে খরচ হল, তা কি সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়নে খরচ করা যেত না?

বিশ্বদীপ ভট্টাচার্য
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

তাপপ্রবাহ ঃ পুঁজিবাদী 'উন্নয়নের' বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে

এ বছরও এক অসহনীয় তাপপ্রবাহে পুড়লো কলকাতা তথা সারা ভারত। প্রবল রোদ আর বাতাসের জলীয় বাষ্প মিলে শরীরে প্রবল অস্বস্তিতে ভুগছে মানুষ। গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে রাজ্যে, দেশে। তাপপ্রবাহের জেরে দিল্লি সহ বেশ কিছু রাজ্যে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ইতিমধ্যেই। যে কোনও নির্মাণ কাজের দিকে তাকালেই দেখা যায় কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে কাজ করছেন শ্রমিকরা। সুরক্ষা বলতে মাথায় জড়ানো একফালি গামছা, সকলের তাও নেই। যে সময় একফোঁটা ছায়ার জন্য মানুষ অস্থির হয়ে যাচ্ছে, রোদের তাপে শরীর জ্বলে যাচ্ছে, সেই সময় এভাবে খোলা আকাশের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করা যতই অসহনীয় হোক, ওঁদের জীবনে এটাই স্বাভাবিক। কাজের সুস্থ পরিবেশ-সুরক্ষা-নিরাপত্তা এই শব্দগুলো যেন এই মানুষগুলোর জীবন থেকে মুছে গিয়েছে কবেই। একটা নির্মাণ কাজ শেষ হলে ক'দিনের মধ্যেই, স্বাভাবিক আবার অন্য কোথাও এই দাবদাহের মধ্যেই হাড়ভাঙা খাটুনির কাজে জুড়ে যেতে হবে ওঁদের, যাঁদের রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সভ্যতার পিলসুজ'।

ঠিক কতটা ভয়ানক এ দেশে শ্রমিক সুরক্ষার পরিস্থিতি? মে-জুন মাসের বড় সময় ধরে 'হিট স্ট্রোক' নিয়ে প্রায়শই রোগীরা এসেছেন দিল্লির নানা হাসপাতালে, যাঁদের অধিকাংশই খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষ, পেটের ভাত জোগাড়ে অসহনীয় গরম সহ্য করে যাওয়া ছাড়া যাঁদের সামনে আর কোনও উপায় খোলা রাখেনি এই সমাজ, এই ব্যবস্থা। এরকম মৃত্যু নিয়ে খবর হলে কদিন একটু নড়েচড়ে বসার ভাব দেখায় সরকার বা কর্তাব্যক্তিরা। যেমন দিল্লির এই ঘটনার পর 'অভূতপূর্ব তাপপ্রবাহের' কথা মাথায় রেখে একটু জলের ব্যবস্থা, রাস্তায় জল ছেটানো, নির্মাণকর্মীদের কাজের সময় পাল্টানোর কথা বলেছে সরকার। সত্যিই কি এই তাপপ্রবাহ 'অভূতপূর্ব'? এই মে-জুন মাসে দেশের বহু রাজ্যে যে তাপমাত্রার পারদ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাপপ্রবাহের জন্য নানারকম সতর্কতা জারি করতে হয়, স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, হিট স্ট্রোকে মানুষের মৃত্যু ঘটে এ তো সাধারণ মানুষের প্রতি বছরের অভিজ্ঞতা। গাছ কাটা-অরণ্য ধ্বংস সহ নানা কারণে এই গরম যে বছর বছর আরও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, এও সবার জানা। অথচ শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আগাম কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনই মনে করে না কি কেন্দ্র কি রাজ্যের সরকারগুলো। গরমের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে 'হিট অ্যাকশন প্ল্যান' নামে একটি পরিকল্পনার খাতায় কলমে অস্তিত্ব আছে বলে শোনা যায়। 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'র নির্দেশ মেনে স্থানীয় পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বিবেচনা করে গরম মোকাবিলার ব্যবস্থা করার কথা এই প্ল্যানের। অথচ এই পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, হলে তার সুফল কারা কী ভাবে পাচ্ছেন এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না কোথাও। তবে নিজেদের ঘাম-রক্ত দিয়ে সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলছেন যাঁরা, সেই শ্রমিকরা যে এসব প্ল্যান-ট্যানের আওতায় আসেন না, সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তথ্য বলছে, এ দেশে প্রতি পাঁচজন শ্রমিকের মধ্যে চারজনই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। কলে কারখানায় শ্রম দেওয়া হাজার হাজার শ্রমিক, খোলা আকাশের নিচে কাজ করা রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী, ডেলিভারি বয়, রাস্তার ফল-সব্জি-খাবার বিক্রেতা, নানা রকম চুক্তিভিত্তিক ঠিকা শ্রমিক, বাড়ি বাড়ি পরিচারিকা, মোট বাহক— এঁরা সবাই পড়ছেন এই 'অসংগঠিত' ক্ষেত্রের আওতায়। সরকারি খাতায় এঁদের নাম নেই, নেই কাজের ন্যূনতম নিশ্চয়তা, কোনও নির্দিষ্ট বেতন, সুরক্ষিত পরিবেশ। দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের আদায় করা অধিকারগুলোই যখন সরকার মানছে না, সংসদে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একের পর এক শ্রমিকবিরোধী আইন পাশ করাচ্ছে, তখন এই অসংগঠিত অনথিভুক্ত মানুষগুলোর অবস্থা যে কি ভয়াবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষের কর্মক্ষম মানুষের প্রায় ৮২ শতাংশ কাজ করেন নানা অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ২০২১-২২ এর সমীক্ষা অনুযায়ী এই সংখ্যাটা প্রায় ৪৪ কোটি। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, কর্মক্ষম শ্রমিকদের ৭৫ শতাংশ, প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন মানুষকে গরমের বিপদ মাথায় নিয়েই শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। (সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ, ২৯ মে, ২০২৪)। শুধুমাত্র ২৩ মে থেকে ৩ জুন, লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন গরমে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন অন্তত ৭৭ জন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভোটকর্মী। 'গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়ভার নিতে বাধ্য যারা, এই ভয়ঙ্কর গরমে তাঁদের উপযুক্ত সুরক্ষা দেওয়ারও দরকার মনে করেনি সরকার। আর আরও অবহেলিত আরও প্রান্তিক যে মানুষগুলো সারা বছর ধরে অমানুষিক খেটে যাচ্ছেন খোলা আকাশের তলায়, তাঁরা এই গরমে কী ভাবে বেঁচে আছেন? কী ভাবেই বা কাজ করছেন? 'ডাউন টু আর্থ' সংগঠনের সমীক্ষায় উঠে এসেছে তাঁদের মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণার ছবি।

কতখানি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে মানুষের শরীর? সমতলের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়ালেই ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের সংজ্ঞা অনুযায়ী তা তাপপ্রবাহ। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ ইন ইউনাইটেড স্টেটস-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী সর্বাধিক ৩৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা এবং ৩০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা পর্যন্ত নিরাপদে কাজ করা যেতে পারে। অথচ এ বছরের এই দীর্ঘ

সাতের পাতায় দেখুন

সংস্কার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থেই

একের পাতার পর

নেই? দেখা যাক।

সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, স্বাধীনতার পর গত পাঁচ দশকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সবচেয়ে তলানিতে পৌঁছেছে। স্থায়ী কাজ নেই বললেই চলে। সরকারি-বেসরকারি সব কাজই এখন চুক্তিভিত্তিক। মজুরি মালিকের ইচ্ছাধীন। শ্রম-সময় বলে কিছু নেই—আট ঘণ্টার পরিবর্তে নয়, দশ এমনকি বারো ঘণ্টা পর্যন্ত খাটাচ্ছে মালিকরা। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয় ক্রমাগত কমাতে কমাতে বেশির ভাগটাই এখন বেসরকারি এবং এর কোনওটিই এখন আর সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নেই। যুব সমাজের একটা বিরাট অংশ গিগ কর্মী হিসাবে বাড়ি বাড়ি খাবার, পণ্য সরবরাহ করে, যাত্রী পরিবহণের কাজ করে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটা প্রায় আড়াই কোটিতে পৌঁছবে। অথচ এদের জন্য কোনও আইনানুগ কিংবা সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাই নেই। ইউনিসেফের রিপোর্ট, ভারতে পাঁচ বছরের নীচে ৪০ শতাংশ শিশুই ভুগছে অপুষ্টিতে। বিশ্ব ক্ষুধাসূচকের সম্প্রতি প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা ১১১তে। ২০২০তেও যা ছিল ৬৬তে। শুধু তাই নয়, অর্থনীতির সময় আদানির মত অনুযায়ী যতই 'ভাল' যাচ্ছে, ততই সাধারণ মানুষ ক্রমাগত নিঃস্বে পরিণত হচ্ছে। এই মুহূর্তে দেশের মোট সম্পদের মাত্র তিন ভাগ আছে দেশবাসীর সবচেয়ে নীচের ৫০ ভাগ মানুষের হাতে। ফলে এই ভাল সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য কী জুটেছে তা স্পষ্ট।

তা হলে গৌতম আদানি অর্থনীতির ভাল সময়ের যে কথা বলছেন, তাতে ভালটা কাদের হয়েছে? এই ভাল সময়টা আসলে এসেছে দেশের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জীবনে, ধনিক শ্রেণির জীবনে। স্বাধীনতার আট দশকে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা যখন গভীর খাদে তলিয়ে যেতে বসেছে তখন দেশের এক শতাংশ পুঁজিপতির হাতে জমা হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০.১ শতাংশ।

গৌতম আদানির কথাই ধরা যাক। ১৯৮৮তে গুজরাটের একটি ট্রেডিং কোম্পানি হিসাবে আদানি গোষ্ঠীর পথ চলা শুরু। সেই রাজ্যে মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় থেকে গতি পেতে থাকে এই গোষ্ঠীর উত্থান। মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে তা উল্কার গতি নেয়। আজ একদিকে এই গোষ্ঠী যেমন বিশ্বে দ্বিতীয় ধনীর স্থানে উঠে এসেছে, তেমনই দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের সিংহভাগ— তাপবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিকাঠামো, বন্দর, বিমান বন্দর, লজিস্টিক্স, খনি, টেলিভিশন, ডিজিটাল সহ সব রকমের সংবাদমাধ্যম, ভোজ্য তেল, সিমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি এখন এই গোষ্ঠীর দখলে। স্বাভাবিক ভাবেই আদানির মতো ধনকুবেররা যে অর্থনীতিতে সুপবন দেখবেন এবং আর্থিক সংস্কারের জয়গান গাইবেন তাতে অবাক হওয়ার কী আছে!

গৌতম আদানির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেসের আর্থিক নীতি এবং বিজেপির আর্থিক নীতির মধ্যে যে কোনও পার্থক্য নেই, পরেরটা যে আগেরটা ধারাবাহিকতাতেই এসেছে, তা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা হওয়ারও কথা নয়। কারণ তাঁর মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারের আর্থিক সংস্কার নীতির ফলটি পুরোপুরি আত্মসাৎ করেছে। সাধারণ মানুষের একাংশ যথার্থ রাজনৈতিক চেতনার অভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির শোষক-চরিত্র এবং সরকারগুলির পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাসের চরিত্র ধরতে না পারায় বিচার করতে বসেন— এই সরকারটা ভাল আর ওই সরকারটা খারাপ। দেশের বামপন্থী দলগুলির বড় অংশেরও শ্রেণিচেতনা গোলমেলে হওয়ার কারণে একই ভুল হয়। তাই তারা অনায়াসে পুঁজিপতিদের একটি জোট এনডিএ-র বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদেরই আর একটি জোট ইন্ডিয়াকে প্রগতিশীল ভেবে বসেন। যে ভুলটি পুঁজিপতিদের হয় না।

অর্থনীতিতে সংস্কার, আধুনিকীকরণ, বিশ্বায়ন প্রভৃতি কথাগুলি শুনতে বেশ ভাল মনে হলেও আসলে এগুলি দেশের মোট জনসমষ্টির কোন অংশের স্বার্থের কথা ভেবে সরকার নিয়ে এসেছে তা আদানির বক্তব্যেই স্পষ্ট। ১৯৯১ সালে নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সরকার এই আর্থিক সংস্কার নীতির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। আর্থিক সংস্কারের গতিমুখ হয়ে দাঁড়ায়— প্রাইভেটাইজেশন, লিবারালাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন। সংস্কারের নামে তা আসলে ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে সরকারি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সেগুলির বেসরকারিকরণ করা তথা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। এটাই প্রাইভেটাইজেশন। পাশাপাশি লিবারালাইজেশন বা উদারিকরণের নামে তাদের মূল করণীয় কাজ ছিল শ্রমিক-কৃষক সহ সব স্তরের সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা-চিকিৎসা সহ সামাজিক সুরক্ষাগুলিকে বিসর্জন দেওয়া। এ ছাড়া একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ আইন বিলোপ করা, শেয়ার বাজার মুক্ত করে, বিদেশি মুদ্রা আইন শিথিল করে দেশীয় সংস্থাগুলিতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া, মালিকদের হাতে ইচ্ছামতো শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুযোগ তুলে দেওয়া, পুঁজিপতিদের আয়কর কমিয়ে দেওয়া এবং তাদের বকেয়া কর মকুব করে দেওয়া, লাইসেন্সের জন্য নানা দপ্তরের অনুমতি নেওয়ার নিয়ম বাতিল করা, ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দেওয়ার মতো একের পর এক সর্বনাশা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এগুলোর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক সহ জনসাধারণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠার ক্ষমতা অর্জন করার উদগ্র লালসার কাছে আত্মসমর্পণের সরকারি নীতিই পাকাপোক্ত হয়।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ততদিনে বিপুল পুঁজির অধিকারী হয়ে উঠেছে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। বিদেশের বাজারে ঢুকে বিদেশি লগ্নিপুঁজির সাথে বোঝাপড়ার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা এবং সেই সাথে দেশের বাজারকেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে সর্বোচ্চ মুনাফা লোটা তখন তাদের উদ্দেশ্য। সেই কারণে তারা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে যাতে গ্লোবালাইজেশনের নীতি নিয়ে এসে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে এবং লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও আর্থিক সংস্থাগুলি তাদের হাতে তুলে দেয়। এক কথায়, গোটা ভারতীয় অর্থনীতিকেই তারা তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বলে এবং ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা তখনকার কংগ্রেস সরকারও তাদের খুশি করতে ঠিক সেই মতোই অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে ব্যাপক ভাবে বদলে ফেলে।

তার ফল হিসাবে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তা আজ সকলেরই জানা। দেশের যে জনসাধারণ ইতিমধ্যেই অশেষ দুর্গতির মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে, এর ফলে তাদের উপর নতুন করে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা ও ভারতীয় একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীর নির্মম শোষণ-নির্যাতন নেমে এল। এত দিনের চালু শ্রম আইনকে বদলে সরকার নতুন শ্রমকোড চালু করল। যার বলে ছাঁটাই, ওয়েজ ফ্রিজ, মজুরি সংকোচন, শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত সুযোগ-সুবিধাগুলি কেড়ে নিল মালিক শ্রেণি, বাড়িয়ে দেওয়া হল শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রমসময়। স্থায়ী কাজ বিলুপ্ত করে দিয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কাজই রেওয়াজে পরিণত করে দেওয়া হল। বাড়িয়ে দেওয়া হল কাজের বোঝা। এমনকি শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত হওয়ার, দাবি জানানোর অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। পরিণতিতে শোষণ মাত্রাতিরিক্ত আকার ধারণ করল।

এক দিকে বেসরকারিকরণের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং জাতীয় সম্পত্তি ও সম্পদের অবাধ লুঠ, অন্য দিকে এই মাত্রাতিরিক্ত শোষণের ফল হিসাবে ভারতীয় বহুজাতিক পুঁজির মুনাফা ও সম্পদের পরিমাণ লাফিয়ে বাড়তে থাকল। এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির গল্প শোনাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর প্রভু আদানিরা, সেই বিপুল সম্পদের মালিক তো এই এক শতাংশ পুঁজিপতিই। তাই ভারতীয় অর্থনীতির পরিমাণ ৫ লক্ষ কোটি হোক, ৭ লক্ষ কোটি হোক বা ৫০ লক্ষ কোটি হোক তার সঙ্গে দেশের ৯৯ ভাগ সাধারণ মানুষের জীবনের সম্পর্ক শুধু এইটাই যে, তাদের উপর সীমাহীন শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়েই গড়ে উঠছে এই সম্পদ। আর পুঁজিপতি শ্রেণির তল্পিবাহক সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা এবং অর্থনীতির ভাড়াটে বিশেষজ্ঞরা এই এক শতাংশ পুঁজিপতির সমৃদ্ধিকেই দেশের সমৃদ্ধি বলে প্রচারের ঢাক বাজাচ্ছে।

এই অবস্থায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত-বঞ্চিত অর্ধাহার-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। সেই ক্ষোভ প্রায়ই দেশের নানা প্রান্তে বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ছে। দিল্লি তথা উত্তর ভারত জুড়ে কৃষক আন্দোলন যার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মানুষের এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভে ভীত শাসক শ্রেণি যে কোনও মূল্যে এই ক্ষোভকে চাপা দিতে বদ্ধপরিকর। বহুজাতিক সংস্থা ও দেশের একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র দেশের মানুষের মধ্যে যে কোনও বিক্ষোভকে নির্মম ভাবে দমন করতে শোষিত জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে নিজেকে নজিরবিহীন স্বৈরাচারী ক্ষমতায় সজ্জিত করে তুলছে। নিয়ে আসছে নিত্য-নতুন কালা আইন। পুরনো আইনগুলিকে আরও কঠোর করে তুলছে। পাশাপাশি, জনগণকে বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত ও অসচেতন অবস্থায় রেখে দিতে তারা সব ধরনের তমসাচ্ছন্ন, জরাগ্রস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণাকেও উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। এর সামগ্রিক ফল হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী ঝোঁক আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

একচেটিয়া পুঁজির এই সর্বাত্মক আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সঠিক শ্রেণিচেতনায় বলিয়ান হয়ে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে সঠিক নেতৃত্বে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন, সমাজ যে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত— একদিকে মুষ্টিমেয় শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি এবং অন্য দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষ এবং ভারত রাষ্ট্রটিও যে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, তা স্পষ্ট করে বোঝা। এই শ্রেণিচেতনার ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে গণসংগ্রামগুলিকে ক্রমাগত তীব্র করতে পারলেই একমাত্র এই আক্রমণকে রোখা সম্ভব।

তাপপ্রবাহ

ছয়ের পাতার পর

তাপপ্রবাহে উত্তর ও মধ্য ভারতে হরিয়ানা রাজস্থান দিল্লি সহ বহু রাজ্যে তাপমাত্রা এই সীমা ছাড়িয়ে গেল, কোথাও কোথাও ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুঁয়ে ফেলল এবং তার মধ্যেই ধুঁকতে ধুঁকতে অসুস্থ হয়ে কাজ করে যেতে বাধ্য হলেন শ্রমিকরা। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বহুদিন আগে লিখেছিলেন— 'হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়/পাহাড় কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাঁদের হাড়।' আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম ইট উৎপাদক দেশ, ২৩ মিলিয়ন শ্রমিকের দিনরাতের শ্রমে প্রতি বছর তৈরি হয় ২৩৩ বিলিয়ন ইট। অথচ সেই ইটের তৈরি ইমারতের তলায় কত শ্রমিকের কান্না আর নিরুপায় যন্ত্রণার ইতিহাস চাপা পড়ে আছে, আজও তার হিসেব নেই। চাষবাসের পরেই দেশের সবচেয়ে বেশি মানুষ (প্রায় ৭৪ মিলিয়ন) যুক্ত যে পেশার সাথে, সেই নির্মাণকর্মীরা এভাবেই বহু জায়গায় কাজ করছেন। একটি সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য গবেষণার তথ্য বলছে, এবারের তাপপ্রবাহে এঁরা অনেকেই আগুন ঝরা গরমে ভারি কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন এমন পরিবেশে, যা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সীমার অনেকখানি বাইরে।

হায় রে শ্রমিকের প্রাণ। পুঁজিবাদের মুনাফা লালসা প্রসঙ্গে মার্ক্স লিখেছিলেন, মালিক ততটুকু মজুরিই শ্রমিককে দেয়, যতটুকু পেলে সে কোনওমতে খেয়েপরে বাঁচতে পারে, পরদিন আবার কাজে আসতে পারে। আজকের মালিকের সে দায়টুকুও নেই, কারণ একশো শ্রমিকের মৃত্যু হলে সেখানে ছুটে আসবে আরও পাঁচশো বুভুক্ষু শ্রমিক। নেতা-মন্ত্রীরা মাঝে মাঝেই দেশের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিতে জিডিপির গল্পশোনান, অথচ সেই জিডিপির সিংহভাগ গড়ে উঠছে যাদের রক্ত জল করা শ্রমে, তারাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। প্রযুক্তির এত উন্নতি সত্ত্বেও এই প্রবল গরমে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের অনন্ত দুর্ভোগে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, কাজের জায়গার সুরক্ষা-নিরাপত্তার ন্যূনতম নিয়ম কানুন কিছুই নেই এই দধীচিদের জন্য। যত দিন যাবে, আরও নিষ্ঠুর আরও অমানবিক হবে মুনাফাসর্বস্ব এই ব্যবস্থার চেহারা। যে সমাজ শ্রমিককে মানুষ মনে করে না, যে সমাজে লক্ষ কোটি শ্রমিকের শ্রমের ফসল চুরি করে মুনাফার পাহাড় বানানোই নিয়মে পরিণত হয়, সেই অসুস্থ সমাজকে ভেঙেই সচেতন শ্রমিককে তৈরি করতে হবে নিজের মুক্তির রাস্তা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 46 Bengali Weekly July 5, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

গাজায় ইজরায়েলের নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মিছিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), সিপিআই(এম) সহ বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে ২৬ জুন এক মিছিল কলকাতায় লেনিন মূর্তি থেকে শুরু হয়ে মার্কিন তথ্যদপ্তরের উদ্দেশে যেতে গেলে পুলিশ পথ আটকায়। সেখানেই বিক্ষোভসভা হয়।

নিট-দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিট-দুর্নীতির তদন্ত, দোষীদের শাস্তি ও সর্বত্র টিবির ওষুধ সরবরাহের দাবিতে ২৬ জুন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের এক মিছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এসপ্ল্যানেডে যায় ও রাজ্যপালকে ডেপুটেশন দেয়।

কেনিয়ায় গণবিক্ষোভ

পাঁচের পাতার পর

প্রেসিডেন্ট রুটো পরদিন ২৬ জুন ঘোষণা করেন, নয়া আর্থিক বিলে তিনি সই করবেন না। ডেপুটি প্রেসিডেন্টও এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিক্ষোভকারীদের প্রতি মিনতি জানিয়ে বলেন, 'আমি একজন বাবার মতো করে আমার ছেলেমেয়েদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে তোমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি বন্ধ করার কথা ঘোষণা করো।"

বোঝা যায় গণবিক্ষোভের তীব্রতায় সরকারের ঘুম ছুটে গেছে। জনসাধারণ জেগে উঠলে হাজারো পুলিশ-মিলিটারি দিয়েও যে শেষরক্ষা করা যায় না, শাসকরা তা জানে। তাই তড়িঘড়ি দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রেসিডেন্ট রুটো। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না বিক্ষোভকারীরা। এই প্রতিবেদন লেখার সময়েও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা।

কোথায় গিয়ে পৌঁছবে এই গণবিক্ষোভ, সময়ই তা বলবে। তবে এ কথা বলা যায় যে, আর্থিক বিল-২০২৪ প্রত্যাহার কিংবা প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবি আদায় হলেই কেনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হবে না। বিক্ষোভের চাপে আপাতত কর বসানোর পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেও রুটো সরকার যে আইএমএফ-এর বিপুল ঋণের দায় শেষ পর্যন্ত সেই খেটে-খাওয়া মানুষের ঘাড়েই চাপাবেন, তা বোঝা কঠিন নয়। একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের বোঝা বইতে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকেই। ফলে সঙ্কটের মূলে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্কট থেকে মুক্তির প্রশ্নটিও যে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সঙ্গে জড়িত—এই উপলব্ধির ভিত্তিতে পুঁজিবাদবিরোধী সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে শোষণমূলক এই ব্যবস্থাটিকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করতে না পারলে কেনিয়ার সাধারণ মানুষের মুক্তি মিলবে না।

কেনিয়ার সাম্প্রতিক এই জনবিক্ষোভ প্রসঙ্গে দু' বছর আগের শ্রীলঙ্কার জনঅভ্যুত্থানের কথা বার বার উঠে আসছে। সেখানেও অত্যাচারিত, বিক্ষুব্ধ জনতার স্রোত দখল করে নিয়েছিল প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ। আতঙ্কে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারকে। কিন্তু সেই আন্দোলন উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারেনি বলে কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তা স্তিমিত করে দেয় শ্রীলঙ্কার শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি। ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় আবারও দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণায় পিষ্ট হতে হচ্ছে সেখানকার খেটে-খাওয়া জনসাধারণকে। উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকলে কেনিয়ার এই উত্তাল জনবিক্ষোভেরও একই পরিণতি হবে কি না—সেই আশঙ্কা থেকেই যায়।

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে
দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে
১০ম সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন
১৯-২২ নভেম্বর, দিল্লি
AIDSO

সরকারকে ব্রিটানিয়া কোম্পানি খোলার ব্যবস্থা করতে হবে ঃ এআইইউটিইউসি

বিস্কুট, কেক সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের তারাতলার কারখানা বন্ধ করার প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২৪ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রি হঠাৎ ১৬ জুন থেকে কারখানা বন্ধকরে দিয়ে ১০০-র বেশি স্থায়ী ও ২৫০ জন অস্থায়ী শ্রমিকের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। অবিলম্বে মালিক ও সরকারকে কারখানা খোলার ব্যবস্থা করে সমস্ত কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি। তাঁর দাবি, সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং কারখানা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিকে সাড়ে ১২ হাজার খাতায় যোগে ভুল কি দ্রুত ফলপ্রকাশের বাহাদুরি নিতে গিয়ে?

বর্তমান বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেরোনোর পর যে স্ক্রুটিনি হয়েছে তাতে মোট ১২,৪৬৮টি খাতায় নম্বর যোগে ভুল বেরিয়েছে এবং সংশোধনের পর ৪ জনের র‍্যাঙ্ক বদলে গেছে ও ৭ জন মেধাতালিকায় নতুন করে উঠে এসেছে। মাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলাফলে এতটা বিচ্যুতি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে, পরীক্ষকরা মন দিয়ে ও যত্ন নিয়ে খাতা দেখেন না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং পরীক্ষকদের অধিকাংশের মতে, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক দুই পরীক্ষারই খাতা দেখা এবং ফলপ্রকাশ নিয়ে পর্ষদ ও কাউন্সিল যে ভাবে তাড়াহুড়ো করে তাতে এই ধরনের ভুল হওয়া— অত্যন্ত অন্যায় ও দুঃখজনক হলেও, মোটেই আশ্চর্যের নয়। তাঁরা বলছেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে হচ্ছে এবং দুই পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ একই সঙ্গে চলছে। এ দিকে প্রতি বছর বহু শিক্ষক অবসর নিচ্ছেন, অথচ রাজ্য সরকারের নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ কার্যত বন্ধ। ফলে এক-একজন শিক্ষককে এক-একটি পরীক্ষার দেড়শোর কাছাকাছি খাতা দেখতে হচ্ছে। তার ওপরে আবার বহু শিক্ষককে একই সঙ্গে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার খাতা একই সঙ্গে দেখতে হচ্ছে। অথচ সময় মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহ। এমনও দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতার প্রথম দফা যেদিন জমা দিতে হচ্ছে, সেইদিনই বা তার পরের দিনই উচ্চমাধ্যমিকের খাতা নিয়ে আসার দিন পড়ছে। অতীতে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের খাতা দেখা যেত না। এখন স্থায়ী শিক্ষক এত কম যে, এই নিয়ম মানা সম্ভব হচ্ছে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, একই রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অধীন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল হলেও, দুয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই এবং কেউ কারও অসুবিধা দেখতে নারাজ। ফলে শিক্ষকদের অনেকের পক্ষেই দু'রকমের খাতা দেখার সঙ্গে স্কুলের ক্লাস, ইউনিট টেস্টের প্রশ্ন করা, খাতা দেখা— এত মানসিক চাপ ও শারীরিক ধকল সামলে মূল্যায়নে সম্পূর্ণ নির্ভুলতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। স্ক্রুটিনিয়ার ও হেড এগজামিনারদেরও একই অবস্থা। তাঁদেরও স্কুলের সব কাজ সামলে এক একজনকে কয়েক হাজার খাতা, মার্কস ফয়েল প্রভৃতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে স্ক্রুটিনি করে পর্ষদ ও কাউন্সিল দপ্তরে পাঠাতে হয়। এই অবস্থা সামাল দেওয়ার একটাই পথ। তা হচ্ছে, দ্রুত স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সমস্ত শূন্য শিক্ষকপদে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা। তাতে এক একজন শিক্ষকের খাতার সংখ্যা কমবে। এরই সঙ্গে পর্ষদ ও কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাতে একই শিক্ষককে দুটো পরীক্ষার খাতাই একই সঙ্গে না দেখতে হয়। কিন্তু পরীক্ষকদের সমস্যা যতই হোক, সরকারি প্রসাদধন্য হওয়ার সুবাদে পর্ষদ ও কাউন্সিলের উচ্চপদে আসীন কর্তাব্যক্তিরা এ সব অভিযোগে কর্ণপাত করতে নারাজ। একটার পর একটা দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির অভিযোগে জেরবার শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা একটু মুখরক্ষা করার মরিয়া তাগিদে কত দ্রুত ফলপ্রকাশ করে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায় সেই নেশায় বছরের পর বছর মেতে আছেন। তাতে সদ্য কৈশোরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের প্রথম পরীক্ষার ফলাফলে যত ক্ষতিই হোক না কেন, তাতে তাঁদের পরোয়া নেই। 'খাতা ঠিকমতো দেখা হচ্ছে না' বলে শিক্ষকদের ঘাড়ে একতরফা দোষ চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিজেরা হাত ধুয়ে ফেলছেন। এই অবস্থায়, শূন্য শিক্ষকপদে দ্রুত নিয়োগ ও ত্রুটিহীন পরীক্ষা পদ্ধতির দাবিতে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র ও অভিভাবকদেরও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া এই অব্যবস্থা নিরসনের অন্য কোনও পথ নেই।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com